পালযুগের অবদান ঃ

বাংলাদেশে পালরাজাদের দীর্ঘ চারশো বছরের শাসন নানাকারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। ড. মজুমদারের মতে, "এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলেই বাঙালির নতুন জাতীয় জীবনের সূত্রপাত হয়। বাংলার রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই পালরাজাদের অবদানে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল।" ড. মজুমদারের মতে, "অষ্টম শতাব্দীতে পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা বাঙালিজাতি, তার ভাষা ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের প্রশ্নাতীতভাবে এক যুগান্তকারী ঘটনা" ("The establishment of Pala empire in the eighth century is unquestionably an poch making event in the evolution of the Bengali people and their language and culture.")। ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, "বাঙালির জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পালরাজারা কৃতিত্বের দাবি করতে

Scanned by CamScanner

পারেন।" একথা ঠিক, পালরাজাদের দক্ষতার ফলেই বাংলা যেমন সর্বপ্রথম আঞ্চলিক শক্তির পরিবর্তে সাম্রাজ্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, তেমনি শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উত্তর ভারতের ক্রমবর্ধমান ধারার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল।

বাংলার ইতিহাসে পালরাজাদের সর্বপ্রথম ও প্রধান অবদান হল রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, অরাজকতা ও অনিশ্চয়তার অবদান ঘটানো এবং প্রকৃত অর্থেই বাংলাকে এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করা। যে 'মাৎস্যন্যায়' অবস্থা বাঙালির জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল, তা থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করার জন্য পালরাজারা অবশ্যই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। শুধু তাই নয়, *ধর্মপাল* ও *দেবপাল* তাঁদের দক্ষতা ও প্রচেষ্টার দ্বারা দাক্ষিণাত্যের দুর্ধর্ষ রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহার-রাজাদের সাথে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কনৌজ দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশের সাথেও তাঁরা বাংলার যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। পালরাজাদের ক্রমবর্ধমান সাফল্যের ফলে বাংলার রাষ্ট্রীয় গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পালযুগে বাংলার সমাজ জীবন ছিল সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর। হিউয়েন সাঙ সমতটের অধিবাসীদের শ্রমসহিষ্ণুতা, তাম্রলিপ্তের অধিবাসীদের চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং কর্ণসুবর্ণের অধিবাসীদের অমায়িকতা ও বাঙালির বিদ্যোৎসাহিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

পালযুগে রমণীগণ ছিল মৃদু, শান্ত, সুভাষিণী এবং সুন্দর। মহিলাদের মধ্যে পর্দাপ্রথার প্রচলন থাকলেও তা কঠোরভাবে পালিত হত না। মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলনও ছিল। এ যুগেই 'দায়ভাগ' আইন অনুসারে স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃত হয়। অবশ্য এর জন্য তাকে পবিত্র বৈধব্য জীবনযাপন করতে হত। সাধারণভাবে এক-পত্নী গ্রহণই নিয়ম ছিল। তবে উচ্চবিত্ত ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহও প্রচলিত ছিল। অসবর্ণ বিবাহের দৃষ্টান্তও বিরল ছিল না। মেয়েদের পাতিব্রত্যের ওপর সেযুগে বিশেষ জোর দেওয়া হত।

পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ওই যুগে শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। পালরাজাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহানুভূতি নিয়ে গড়ে উঠেছিল 'বিক্রমশীল-বিহার' ও 'নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়'। এগুলিতে দেশবিদেশের বহু ছাত্রছাত্রী নানাবিষয়ে পঠনপাঠন করতে পারত। পালযুগেই বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যে অলংকারবহুল গৌড়রীতির উদ্ভব হয়। এই যুগে বাঙালি গ্রন্থকারদের মধ্যে *'চতুর্বেদ'*-এ অভিজ্ঞ দণ্ডপানি, *'মুদ্রারাক্ষস'* প্রণেতা বিশাখদত্ত, *'দায়ভাগ'* রচয়িতা জীমূতবাহন, *'রামচরিত'* রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। *'রামচরিত'* পালযুগে রচিত একমাত্র কাব্যগ্রন্থ। এর প্রতিটি পদের দু-রকম অর্থ ছিল। পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণবিন্যাস ও শব্দযোজনা করলে এটি একদিকে রামায়ণের রামচন্দ্র ও অপরদিকে পালরাজা রামপালের জীবনী বর্ণনা করেছে। শূরপাল ও বঙ্গসেন চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর মৌলিক গ্রন্থও পালযুগে রচনা করেছেন। চক্রপানি দত্তের *'চিকিৎসা সংগ্রহ'*-ও চিকিৎসা-বিষয়ক একটি অমূল্য গ্রন্থ।

পালযুগে বাংলা ভাষার নবজন্ম ঘটেছিল। 'মাগধী' ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পালযুগেই বাংলা ভাষা তার স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে। মাগধী ও শৌরসেনী ভাষার মিশ্রণে এই ভাষা আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে। এই স্বতন্ত্র ধারায় লিখিত প্রথম বাংলা ভাষা *'চর্যাপদ'* নামে খ্যাত।

পাল আমলে বাংলার স্থাপত্যশিল্পেও নবযুগ সূচিত হয়েছিল। স্বতন্ত্র নির্মাণশৈলীর জন্য পরবর্তী কয়েক শতক বাংলার শিল্প 'পালযুগের শিল্প' নামে অভিহিত হত।

পালযুগে স্থাপত্যশিল্প নিদর্শনের অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে গেছে। তবুও ধ্বংসস্তূপ থেকে যে নিদর্শন

Scanned by CamScanner

আবিষ্কৃত হয়েছে, তা আমাদের বিস্মিত করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ও তিব্বতের বহু বিহার পালযুগে নির্মিত সোমপুর বিহার ও ওদন্তপুর বিহারের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা। 'সোমপুর বিহারটি' ছিল সম্ভবত পাঁচতল ও ষোলো কোণবিশিষ্ট। চারদিকে ছিল চারটি সিংহদরজা ও চারটি গর্ভগৃহ। এ ছাড়া, 'পাহাড়পুরের বিহারটি'-ও ছিল পালযুগের অনন্য কীর্তি। ড. *নীহাররঞ্জন রায়ের* মতে, এটি ছিল প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যশিল্পের বিস্ময়।

পালযুগের ভাস্কর্যের প্রধান ক্ষেত্র ছিল সাধারণ মানুষের জীবনধারা ; দেবদেবীর নয়। পোড়ামাটি ও কালোপাথরের ওপর নির্মিত এইসব মূর্তি ছিল স্বাভাবিক ও সজীব। এ ছাড়া, ব্রোঞ্জ ও পাথর খোদাই করেও ভাস্কর্য নির্মিত। চিত্রশিল্পেও পালযুগ অগ্রণী ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহাযান-বজ্রযান-হীনযান প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে চিত্রগুলি রচিত হয়েছিল। চিত্রগুলির রচয়িতাগণ নিঃসন্দেহে প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিলেন। পালযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পী ছিলেন *বীতপাল* ও *ধীমান*।

পালযুগে ধর্মের ক্ষেত্রেও পুনরুজ্জীবনের আভাস পাওয়া যায়। পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান ঘটেছিল। এই সময় নির্মিত হয়েছিল বহু বৌদ্ধমঠ ও বিহার। বৌদ্ধ আচার্য ***অতীশ দীপঙ্কর*** (শ্রীজ্ঞান) পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে গমন করেছিলেন, তবে কোনোরূপ ধর্মীয় গোঁড়ামি পালরাজাদের ছিল না।

এইভাবে রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পালযুগে বাংলার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছিল। তাই ড. ***স্মিথ*** যথার্থই বলেছেন, ভারতের রাজবংশগুলির ইতিহাসে বাংলার পালবংশ বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর ভাষায় ঃ *"The Pal dynasty deserves to be remembered as one of the most remarkable of the Indian dynasties."*

Scanned by CamScanner